বেঙ্গল টাইমস

২৫ এপ্রিল, ২০২৫

মগজ ধোলাই

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

সম্পাদকীয়

উন্মাদের পাঠক্রম

এ বড় সুখের সময় নয়। একদিকে ধর্নায় বসে আছেন হাজার হাজার কর্মহারা শিক্ষক। অন্যদিকে, দাঙ্গায় ঘরছাড়া অনেকেই। সরকারের যে কী কাজ, সেটা সরকার জানে বলে মনে হয় না। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির ফলে এত হাজার হাজার মানুষ চাকরিহারা। অথচ, সরকার কেমন বেমালুম সেই দায় চাপিয়ে দিচ্ছে বিরোধীদের ওপর। কে যোগ্য আর কে অযোগ্য— সেই তর্কের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে যারা আসল মাথা, তাদের নাম। তাদের ধরার ব্যাপারে বা খুঁজে বের করার ব্যাপারে সিবিআইয়ের কোনও আগ্রহ আছে বলে মনেও হয় না। শিক্ষকরা যোগ্য না অযোগ্য, সে প্রশ্নের থেকেও বড় প্রশ্ন, সরকার যাঁরা চালাচ্ছেন, তাঁরা আদৌ যোগ্য তো! যাঁরা তদন্ত করছেন, তাঁরা আদৌ যোগ্য তো! নইলে, সাধারণ খোলা চোখে যে দুর্নীতি দেখা যায়, এত তদন্তের পরেও তা আড়াল হয়ে যায় কেন?

এরই মাঝে হয়ে গেল বামেদের ব্রিগেড সমাবেশ। জমায়েত বেশ সমীহ জাগানোর মতোই। কিন্তু এটাকে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত ভাবলে ভুল হবে। রাজ্যে অদ্ভুত এক মেরুকরণ। ধর্মের মেরুকরণ। কেন্দ্র, রাজ্য— দুই সরকারই এই ধর্মের মেরুকরণই জিইয়ে রাখতে চায়। তাই দাঙ্গা হলে তাঁরা লজ্জিত হন না। বরং, একটা চাপা উল্লাস চোখে পড়ে। টিভিতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘৃণার ফোয়ারা। দায়িত্বশীল লোকেরাও কী অবলীলায় সেই ঘৃণার প্রচার করে চলেছেন। সাংবিধানিক পদে বসে থাকা লোকেরাও কী অবলীলায় ঘৃণাকে উস্কে দিচ্ছেন। এর থেকে উত্তরণের কি কোনও রাস্তা নেই। অন্তত এখনই কোনও আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। কারণ, এই অর্বাচীনদের আমরাই ডেকে এনে ক্ষমতায় বসিয়েছি। মাশুল তো আমাদেরই দিতে হবে।

কাজটাও সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে

সরল বিশ্বাস

আরও একটা ব্রিগেড সমাবেশ। এবার অনেকটাই প্রান্তিক মানুষের ব্রিগেড। আবার সেই চেনা প্রশ্ন, বামেরা কি ঘুরে দাঁড়াবে? বামেরা কি শূন্য দশা কাটিয়ে উঠতে পারবে? বাম সমর্থকরা হতাশ হতেই পারেন, কিন্তু এখনই অবস্থার আমূল পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা চোখে পড়ছে না। চোখে দূরবীন লাগিয়েও পড়ছে না।

বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না। ২০১৯, ২০২১, ২০২৪ — তিনটি বড় মাপের নির্বাচনেই শূন্যতা কাটেনি। এত তাড়াতাড়ি সেই শূন্য দশা কেটে যাবে, এমন আশা না করাই ভাল। তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি— বিরাট অংশের মানুষ এখনও এই তত্ত্বেই বিশ্বাস করেন। তাঁদের ভাবনা ঠিক

হোক, ভুল হোক, তাঁরা যে এমনটা ভাবছেন, এটা ঘটনা। এখনই বামের পালে হাওয়া লাগবে, এমন দুরাশা আমার অন্তত ছিল না।

বামেরা তাহলে কী করলে ঘুরে দাঁড়াবে? অনেকেই এমনটা জানতে চান। সত্যি কথা বলতে কী, এর চটজলদি কোনও সমাধান সূত্র নেই। তিন থেকে একধাক্কায় একে উঠে আসার নজির ভারতীয় রাজনীতিতে তেমন একটা নেই। মনে রাখতে হবে, ২০১১-তে মানুষ শুধু তৃণমূলকে আনেনি, বামেদের প্রত্যাখ্যানও করেছিল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত একটা ক্ষোভ ব্যালট বাক্সে ঝড় তুলেছিল। তৃণমূলের ওপর কি ক্ষোভ তৈরি হয়নি?

হয়তো আরও বেশি ক্ষোভ, আরও বেশিই মোহভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু এখনই তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যানের জায়গায় আমজনতা আসেনি। কারণ, বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী শক্তিও সেভাবে উঠে আসেনি। ২০১৯ এর পর বিজেপির যদিও একটা উত্থান হয়েছিল, সিবিআই-ইডির লাগাতার ব্যর্থতায় সেই মোহ অনেকটাই চটকে গেছে। সেই পরিসর বামেরা এখনই নেবে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। এখনই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন নেই, ক্ষমতার হাতবদলের প্রশ্নও নেই। তাহলে খামোখা মানুষ এইসব শিবিরে ভিড়তে যাবেন কেন?

বলা হয়, বামেদের আরও রাস্তায় নামতে হবে। আন্দোলন করতে হবে। কিন্তু সেসব করতে তো বড় মাপের সংগঠন লাগে। মানুষকে একত্রিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু ছোট ছোট সামাজিক কাজ তো করা যায়। বামেরা কি সেইসব সামাজিক কাজে নিজেদের যুক্ত রাখছেন? এটা অনেক বেশি জরুরি। আচ্ছা, আপনি কাউকে রক্ত দিতে গেলে তৃণমূল বা পুলিশ নিশ্চয় বাধা দিতে আসবেন না। সারা জীবনে কজনকে রক্ত দিয়েছেন? শিবিরেই বা কবার দিয়েছেন? হাসপাতালে গিয়েই বা কজনকে দিয়েছেন। গোটা জেলা কমিটি ধরে যদি সমীক্ষা হয়, দেখা যাবে, অনেকে একবারও দেননি। অনেকে একবার, মেরেকেটে দু'বার। অথচ, পঞ্চাশ বছরের এক কর্মী বা নেতা চাইলে পঁচিশ থেকে তিরিশবার দিতে পারতেন। জেলা কমিটিতে এমন একজনকেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

আত্মীয়দের জন্য বা শ্বশুরবাড়ির লোকের জন্য অনেককেই হাসপাতালে যেতে হয়। তার

বাইরে! পাড়া পড়শি হোক বা বন্ধু, পার্টি কমরেড হোক বা পাশের গ্রামের মানুষ। এঁরা যখন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, আমরা কজন তাঁদের দেখতে যাই। কজন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি? কেউ মারা গেলে গত দশ বছরে কবার শ্মশানে গেছি? যদিও বা যাই, কতক্ষণে ফেসবুকে সেই ছবি ছাড়ব, তার জন্য প্রাণ ছটপট করে। তারপর কটা লাইক আর কমেন্ট পড়ল, গুনতে থাকি।

অনেকে বলবেন, রেড ভলান্টিয়ারদের কথা। হ্যাঁ, করোনা কালে বাম ছাত্র যুবদের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। কিন্তু তার ধারাবাহিকতা আর রইল না। তাছাড়া, যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ছাড়ার তাগিদটাও বেশ ভালমতোই লক্ষ্য করা গেছে। সত্যিকারের মানুষের পাশে থাকলে ঢাক পেটানো কি সত্যিই খুব জরুরি? মানুষকে জানান দেওয়া কি খুব জরুরি? এতে যাঁর পাশে দাঁড়ালেন, তাঁকে কি কোথাও ছোট করা হল না? তাঁর কৃতজ্ঞতা বিরক্তিতে বদলে গেল না তো?

কারও জন্য হাসপাতালে গেলে, তাঁর পরিবারের লোকেরা ঠিকই জানবেন। একসময় পাড়াপড়শিও জানবেন। এর জন্য চটজলদি ছবি আপলোড করার কোনও দরকার নেই। বরং তাতে হ্যাংলামিটাই আরও বেশি করে বেআব্রু হয়।

সব পাড়াতেই অনেক বয়স্ক মানুষ থাকেন। যাঁদের ছেলে হয়তো বাইরে থাকেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়ো বুড়ি সারাদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আপনার চেনা জানার বৃত্তেও এমন মানুষের অভাব নেই। মাসে কবার এমন মানুষদের বাড়িতে যান! টুকটাক এটা-সেটা এনে দেওয়া, নিদেনপক্ষে তাঁদের গল্প শোনা— এটুকু তো করাই যায়। আমরা আদৌ করি কি?

সবাই সবকিছু বোঝে। কাউকে কিছু বোঝাতে যাবেন না। আপনি যেটা ফেসবুক দেখে জেনেছেন, সেই মানুষটা সেটা জেনেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। রাস্তায় নামা, গণ আন্দোলন গড়ে তোলা। এগুলো তো অনেক বড় ব্যাপার। আগে এই ছোট ছোট কাজগুলো শুরু হোক। শূন্যের গেরো এমনি এমনি কাটবে না। কাজটাও সেই শূন্য থেকেই শুরু করতে হবে।

স্মৃতির ব্রিগেড, সহজ পাঠের ব্রিগেড

ড. অরিন্দম অধিকারী

ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি গরম জামা প্যান্ট পরিয়ে দাও। আমার ধুতি পাঞ্জাবিটা কোথায়? তাড়াতাড়ি দাও। নাহলে ওদিকে আবার খড়্গপুর লোক্যালটা ধরতে পারব না।

সকাল সকাল হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বইছে। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাসে করে পাঁশকুড়া, তারপর ট্রেনে করে হাওড়া। মা বারবার বলে দিচ্ছেন হাওড়ার স্টেশনে বাবার হাত শক্ত করে ধরে রাখবি। প্রচুর লোক হবে। নাহলে হারিয়ে যাবি। হারিয়ে গেলে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির তলায় দাঁড়িয়ে থাকবি। বাবা ঠিক খুঁজে নেবে।

গিরিবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র অরিন। বাবা হাইস্কুলের শিক্ষক। আবার জেলা পরিষদের সদস্য। বাবার হাত ধরে আজ তার গন্তব্যস্থল কলকাতা। সে কিশলয় বইতে পড়েছে শোভা থাকে কলকাতায়। সেখানে গোলদিঘি আছে।

দিঘিটা গোল নয়। ওটা ওর নাম তো। সে আজ দোতলা বাস দেখবে। খুব আনন্দ তার। অরিন তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, বাবা আজ আমরা কলকাতা যাচ্ছি কেন? বাবা বলল, ওখানে একটা খুব বড় মাঠ আছে। ওখানে প্রচুর মানুষ আসবেন। অরিনের প্রশ্ন, আমাদের ফুটবল মাঠের থেকেও বড়? বাবা শুনে বললেন, আরে আমাদের গ্রামের মাঠের থেকেও অনেক গুণ বড়।

আসলে, অরিন দু'বছর আগে ১৯৮৭ সালে ওদের গাঁয়ের মাঠে প্রচুর মানুষকে আসতে দেখেছিল। অরিন বাবাকে জিগ্যেস করল, কলকাতার বড় মাঠে কী হবে? বাবা অরিনকে বলেছিল, ওখানে মৃদুলের বাবা মৃগেনবাবু বক্তব্য রাখবেন। অরিন শুনেই বলল ওও মৃদুলের বাবা মৃগেনবাবু। আমি পড়েছি কিশলয় বইতে। খুব ভাল লোক মৃদুলের বাবা। শ্রমিক কৃষক সবাইকে ভালবাসেন। অনেক দেশ ঘুরেছেন।

পাঁশকুড়া থেকে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। অরিন খুব আনন্দ পাচ্ছে। সে কলকাতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা বড় নদী আসতেই তার প্রশ্ন, বাবা এটা কি বেত্রবতী নদী? বাবা বলল, না এটা রূপনারায়ণ যেখানে আমাদের বাড়ির পাশের কাঁসাই নদী এসে মিশেছে। ওই যে দূরে অনেক নৌকা। ওখানে কি প্রভাত আর আক্রম মাছ ধরছে? অরিনের বাবা মুচকি হাসল। ট্রেনে প্রচুর লোক। কত লোক ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে। সবার ব্যাগে মুড়ি শশা পেঁয়াজ। কেউ কেউ পাঁশকুড়া মেচেদার চপ কিনছে। অরিন খুব আনন্দ পাচ্ছে। তারপর ট্রেন অনেক গুলো স্টেশন পার হতেই দেখতে পেল কারখানা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অরিন তার বাবাকে জিগ্যেস করল, ওটা কী? বাবা বলল, চটকল। অরিন সাথে সাথে বলে ওখানে পরেশ কাজ করে? আমি কিশলয়ে পড়েছি পরেশ কাজে যায়। সে চটকলে কাজ করে। বাবা আবার মুচকি হাসল। অরিন পৌঁছে গেল হাওড়ায়। মায়ের কথামতো বাবার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। সে অপার আনন্দ নিয়ে দেখল হাওড়ার ব্রিজ, গঙ্গা নদী, লঞ্চ, ইডেন গার্ডেন, আকাশবাণী ভবন, দোতলা বাস।

সে যখন সেই মাঠটায় এল, সে দেখতে পেল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আর লক্ষ লক্ষ মানুষ। সবার হাতে লাল পতাকা। যেন লাল সমুদ্র। যেখানে শুধু লাল লহরী। সে এতক্ষণে বুঝল সে মিটিংয়ে এসেছে। অরিন বাবাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এখানে কারা এসেছে? বাবা একটু থেমে বলল, এখানে তোর কিশলয় বইয়ের ভূষণ এসেছে যে ময়ূর বনের হাটে ধূপকাঠি বেচে। পরেশ এসেছে যে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করে। রেবা এসেছে যাদের চালাঘর ঝড়ে উড়ে গেছে। বাদল, নারান, হাসান সবাই এসেছে। ওই বাদল যে গান গায়, ওই হাসান যে সানাই বাজায়। বাবা বলল হ্যাঁ। বাবা অর্জুন সর্দার আসবে না যে ধর্মপুর গাঁয়ে ছুটে গিয়ে খবর দিয়েছিল সুবর্ণরেখা নদীর বাঁধে ফাটল ধরেছে। বাবা কিশলয়ের রঞ্জন মঞ্জুলাদিও তো আসবে। যারা পঞ্চায়েতের মাঠে পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর জন্মদিন পালন করে। অরিনের বাবা বলল, সবাই আসবে। অরিনরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ব্রিগেড যায় কারণ….

আমরা লড়েছি কাকদ্বীপে
লড়েছি তেলেঙ্গানায়।
আমাদেরই নাম লেখা আছে
ব্রিটিশের জেলখানায়।।

ভোটের দিকে যেন তাকিয়ে থাকতে না হয়

সুমন সিংহ

মেট্রো রেলকে একসময় আমরা বলতাম পাতাল রেল। এখন মাটির ওপরেই ছুটতে দেখা যায়। ফলে, এখন আর পাতাল রেল বলতে তেমন শোনা যায় না।

শিয়ালদার সঙ্গে সল্টলেক আগেই যুক্ত হয়েছে। সেই ট্রেন দিব্যি চলছে। আবার হাওড়া থেকে ধর্মতলা রুটেও ট্রেন চলছে। এটি অবশ্য যথার্থই পাতাল রেল। কারণ, ট্রেন শুধু মাটির তলা দিয়ে নয়, একেবারে গঙ্গার তলা দিয়ে ছুটছে।

মাঝে বাকি ছিল ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ অংশটুকু। এই অংশটুকু জুড়ে গেলেই হাওড়া থেকে সরাসরি আসা যাবে সল্টলেকের করুণাময়ী বা সেক্টর

ফাইভে। সেক্টর ফাইভ বা নিউটাউনে কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে কাজ করেন। তাঁদের অনেকেরই বাড়ি কলকাতার বাইরে শহরতলিতে। অনেকেই হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করে সেক্টর ফাইভে পৌঁছোয়। বাসগুলো এতটাই ভিড় থাকে, বাইরে থেকে তাকানো যায় না। ভেতরে যাঁরা থাকেন, তাঁদের যে কী দুর্ভোগ পোহাতে হয়, সহজেই অনুমেয়। আরও খারাপ লাগে বিকেল বা সন্ধের দিকে। কাজ শেষ করে তাঁরা যখন বাড়ি ফেরেন, বাসে ওঠা যেন এক যুদ্ধ।

মেট্রো চালু হয়ে গেলে এই সমস্যা অনেকটাই কমবে। তখন সল্টলেক থেকে অনায়াসেই হাওড়া পৌঁছোনো যাবে। ধর্মতলা (এসপ্লানেড) থেকে শিয়ালদা অংশের কাজ নানা জটিলতায় বারবার থমকে গেছে। খবরে প্রকাশ, এই দুই স্টেশনের মাঝে নাকি ট্রায়াল রান শুরুও হয়ে গেছে।

তবে আমাদের দেশে রেলের সঙ্গে ভোটের একটা সম্পর্ক আছে। ২০২৫ সালে এই রাজ্যে কোনও ভোট নেই। কী জানি, সেই কারণে কেন্দ্র হয়তো গড়িমসি করতেও পারে। কেন্দ্রের শাসকরা ভেবে নিতেই পারেন, এই বছর যখন ভোট নেই, তখন ট্রেন চালু করে কী লাভ হবে? তার থেকে পরের বছর ভোটের আগে উদ্বোধন হওয়াই ভাল। টাটকা স্মৃতি হিসেবে মানুষের মনে থাকবে।

রেল কর্তাদের কাছে অনুরোধ, এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। প্রকল্পের খরচ যেমন বেড়েছে, তেমনই নানা দীর্ঘসূত্রিতায় সময়ও বেড়েছে। কাজ যদি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে দ্রুত ধর্মতলার সঙ্গে শিয়ালদহকে জুড়ে দেওয়া হোক। এই লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হোক। মোদ্দা কথা, হাওড়া থেকে সেক্টর ফাইভ নিরবিচ্ছিন্নভাবে ট্রেন চলাচল শুরু হোক।

সরকার দাঙ্গার চাষ করে, তাই দাঙ্গা হয়

রক্তিম মিত্র

অনেকদিন আগের নেওয়া ইন্টারভিউ। এখনও ইউটিউবে খুঁজলে পাওয়া যায়। একদিকে জ্যোতি বসু। তাঁর সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন জাভেদ আখতার। বিষয় ছিল, বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এই রাজ্যে কেন দাঙ্গা হয় না? খুব সহজ উত্তরে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'কিঁউ কি হুকুমত নেহি চাহতি।' অর্থাৎ, প্রশাসন চায় না, তাই দাঙ্গা হয় না।

কথাটা আপাতভাবে বেশ মামুলি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে তার তাৎপর্য মারাত্মক। অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না। যত দিন যাচ্ছে, কথাটার মর্ম যেন বুঝতে পারছি। তখনও সময় বেশ উত্তাল ছিল। নব্বইয়ে রামমন্দির প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে ছুটছে আদবানির রথ। যে রাজ্যের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, সেই রাজ্যেই অনিবার্য দাঙ্গা। বাংলার মাটি রক্তাক্ত হয়নি। কারণ প্রশাসন সজাগ ছিল। তারও দু'বছর পর। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস। গোটা দেশজুড়ে দাঙ্গা পরিস্থিতি। কলকাতা বা বাংলাতেও তার ছোঁয়া লাগতেই পারত। কিন্তু পরিস্থিতি আগাম আঁচ করে দ্রুত সেনা নামিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্বে এনেছিলেন জ্যোতি বাবু।

জ্যোতি বসু কতখানি সফল, কোথায় অসফল, তাই নিয়ে নানা আলোচনা চলতেই থাকে। কিন্তু তিনি কত দূরদর্শী প্রশাসক ছিলেন, অন্তত এই দুই ঘটনা থেকে পরিষ্কার। কিন্তু এখন দাঙ্গা যেন জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু একটা উপলক্ষ পেলেই হল। কখনও হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে, কখনও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকায়। আর মালদা, মুর্শিদাবাদ তো আছেই। সমাজমাধ্যমে যেসব ছবি ছড়িয়ে যাচ্ছে, তা ভয়াবহ। উস্কানি ছড়ানোর জন্য ভুয়ো ছবি আছে, এটাও ঘটনা। কিন্তু সত্যি ছবিগুলোও মারাত্মক। শুধু ধর্মের নামে এই হিংসা, হানাহানি— প্রশাসন কার্যত নীরব দর্শক।

দাঙ্গায় কার লাভ? একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। একদল তাকিয়ে সংখ্যালঘু ভোটের দিকে। অন্যদল সংখ্যালঘুদের জুজু দেখিয়ে সনাতনী ভোট বাক্সে পুরতে মরিয়া। কেউ বলছেন ইসলাম খাতরে মে হ্যায়। কেউ বলছেন, হিন্দু খাতরে মে হ্যায়। দশ বছর আগেও তো কেউ এতখানি ‘খাতরে মে’ ছিল না। হঠাৎ, এমন বিপদ নেমে এল কেন? একদল বুঝে গেছে, মুসলিম ভোট যদি ঠিকঠাক বাক্সে ঢুকে যায়, হাজার দুর্নীতি করলেও কোনও চিন্তা নেই। তিরিশ হাতে নিয়ে খেলতে নামলে বাকি পনেরো ঠিক এসে যাবে। অন্য দলের হাতে আছে সিবিআই, ইডি। আছে আস্ত একটা কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ব্যর্থতার পাল্লা এতটাই ভারী যে, হিন্দু হিন্দু করা ছাড়া গতি নেই। এগারো বছর ধরে মোদি প্রধানমন্ত্রী, তারপরেও যদি বলতে হয়, হিন্দু খাতরে মে হ্যায়, সেটা যে কতবড় লজ্জার, এই আহাম্মকরা এই সহজ সত্যিটুকুও বোঝেন না।

কেউ হিন্দুর জুজু দেখাচ্ছেন। কেউ মুসলিম জুজু দেখাচ্ছেন। এই জুজু দেখানোই ওঁদের হাতিয়ার। এঁরাই কেউ রাজ্যে, কেউ কেন্দ্রে সরকার চালাচ্ছেন। সরকারের কাজ কী, এই অর্বাচীনরা সত্যিই জানেন না। কোন মঞ্চে কোনটা বলতে হয়, কোন মঞ্চে কোনটা বলতে নেই, এই ন্যূনতম শিক্ষাটুকুই নেই। এঁরা চালাবেন প্রশাসন? নিজেদের সীমাহীন ব্যর্থতা ঢাকতে দাঙ্গাই এদের হাতিয়ার। ঘর জ্বলুক, মানুষ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাক। এঁরা সেই আগুনে রুটি সেঁকবেন। দায়ী আমরাই। যেমন প্রশাসক আমাদের পাওয়ার কথা, তেমনটাই তো পেয়েছি।

মিডিয়া সমাচার

বাংলাস্ফিয়ারের নদী এভাবেই বয়ে চলুক

হরিশ মুখার্জি

দেখতে দেখতে তিন বছর হয়ে গেল। একটা ইউটিউব চ্যানেলেরও তিন বছর পথ চলা মানে খুব সহজ ব্যাপার নয়। গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ইউটিউব চ্যানেল এল। আবার নিঃশব্দে হারিয়েও গেল। শুরুতে অনেকে ভেবে নেন, ইউটিউব চ্যানেল মানেই বোধ হয় প্রচুর রেভিনিউ। কিন্তু এই মোহটা ভাঙতে সময় লাগে না। ঠিকঠাক কনটেন্ট দেওয়া, ধারাবাহিকভাবে লেগে থাকা, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ঠিকঠাক প্রোমোট করা। এই তিনের মেলবন্ধন না থাকলেই একসময় উৎসাহ হারিয়ে যায়। মাঝপথেই পথ চলা থমকে যায়।

এখানে যে ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে আলোচনা, তা হল বাংলাস্ফিয়ার। আর দশটা জনপ্রিয় চ্যানেলের তুলনায় সাবস্ক্রাইবার হয়তো কম। একেকটি ভিডিও যে লাখ লাখ লোক দেখেন, এমন নয়। দারুণ ভাইরাল হয়ে যায়, এমনও নয়। পথেঘাটে এটা নিয়ে দারুণ চর্চা হয়, তাও নয়। কিন্তু সেই কোনকাল আগে নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন, স্কোরবোর্ড হল একটি গাধা। সে আসলে কিছুই বলে না। ইউটিউবের ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। সাবস্ক্রাইবার দিয়ে বা ভিউয়ার দিয়ে কতটুকুই বা বোঝা যায়। লাইক বা কমেন্ট দেখেও আসলে কিছুই বোঝা যায় না। বুঝতে হয় সেই নদীতে নেমে, বুঝতে হয় আরও গভীরে গিয়ে।

চটকদারি জিনিসে প্রাথমিক ভিউয়ার অনেক বেশি। কিন্তু একসময় চালাকিটা ধরা পড়ে যায়। এই চ্যানেলের দর্শক–শ্রোতাদের ক্লাস একটু অন্যরকম। তাঁদের খিদেটাও অন্যরকমের। এক–দুটো এপিসোড হয়ত অনেকে দেখেছেন। যাঁদের ভাল লেগেছে, তাঁরা টিকে আছেন। যাঁদের ভাল লাগেনি, তাঁরা হারিয়েও গেছেন। আসলে, আর দশজন স্বঘোষিত সবজান্তার থেকে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের ফারাক যে অনেকটাই। এত বছরের অভিজ্ঞতা, এত গুণীজনের সান্নিধ্য, বিস্তর পড়াশোনা, ইতিহাসকে এত কাছ থেকে দেখা, সেইসঙ্গে দুরন্ত বিশ্লেষণ। এর একটা আলাদা মূল্য তো

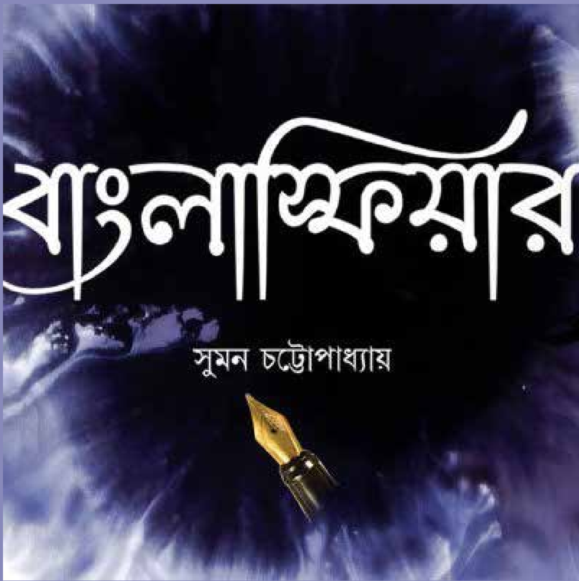

আছেই। আবার এটাও ঠিক, এগুলো সবার ভাল লাগবে না। যাঁরা সেই ইতিহাস জানেন না, যাঁদের বিশ্লেষণ শোনার মতো মনন বা ধৈর্য নেই, তাঁদের ভাল না লাগারই কথা।

এখানে অহেতুক খেউড় নেই। গলা ফুলিয়ে চিৎকার নেই। অকারণ চাঞ্চল্য তৈরি করার মতো হেডিং নেই। এ এক শান্ত নদীর মতো। আপনি বুঝে সুঝেই স্নান করতে নামুন। ঢেউয়ের তরঙ্গ হয়ত পাবেন না। তবে নদীর স্নিগ্ধতা পাবেন। এমন কিছু জানতে পারবেন, যা আপনি আগে কোথাও শোনেননি। এমন কিছু বিশ্লেষণ পাবেন, যা শুনে মনে হবে, আগে তো এভাবে ভাবিনি। আটের দশক বা নয়ের দশকে দিল্লির রাজনীতির চেহারাটা কেমন ছিল, সেই ছবিটা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। স্বভাবতই সুমনবাবুর মেলামেশা যাঁদের সঙ্গে ছিল, তাঁদের কথা, স্মৃতিচারণ ঘুরেফিরে আসে। সেটাই তো স্বাভাবিক।

কখনও জ্যোতি বসুর কথা, কখনও প্রণব মুখার্জির কথা, কখনও সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির কথা। আবার কখনও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস, সোমনাথ চ্যাটার্জিদের কথাও। এইসব মানুষেরা নিজেদের কথা মুখ ফুটে জাহির করতেন না। ফলে, অনেকটাই অজানা থেকে গেছে। যাঁরা এঁদের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন, তাঁদের মুখ থেকে যেটুকু জানা যায়। বিশ্লেষণের সঙ্গে আপনি একমত হতেও পারেন, নাও হতে পারেন। কিন্তু শুনতে বা জানতে আপত্তি কোথায়?

এবার যাঁরা শুধু মমতা, মোদি ছাড়া কিছু বোঝেন না, তাঁদের ভাল নাও লাগতে পারে। যাঁদের রাজনীতি চর্চার দৌড় ওই ফেসবুকের কয়েকটা লঘু পোস্ট বা মিম, তাঁদের ভাল লাগার কথাও নয়। ভাল জিনিস গ্রহণ করতে গেলে একটা

আধার লাগে। রবিশঙ্করের সেতার বা চৌরাশিয়ার বাঁশি কি যাকে তাকে শোনানো যায়! তেমনই কিছু পড়াশোনা না থাকলে এই চ্যানেল আপনার ভাল লাগবে না। কোথাও কোনও ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা কি নেই? ১) অনেকসময় আলোচনার পরিসরটা বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে। চল্লিশ মিনিট, পয়তাল্লিশ মিনিটও হয়ে যাচ্ছে। ফলে, কিছু অতিকথন এসে যাচ্ছে। পুনরাবৃত্তিও এসে যাচ্ছে। অনেকের হয়ত এতখানি ধৈর্য না থাকতেও পারে। ২) বয়সের একটা প্রভাবও কাজ করছে। একসময় যেমন বাগ্মী ছিলেন, সেই ধার কিছুটা কমবে, সেটাই স্বাভাবিক। ৩) কিঞ্চিত আত্মপ্রচারও এসে যাচ্ছে। তবে তিনি তো নিজের অভিজ্ঞতা বলতে বসেছেন। তাই একটু আধটু আসাটা অস্বাভাবিকও নয়। কোথাও কোথায় হয়ত একটু মাত্রা ছাড়াচ্ছে। ৪) তিনি যে খুব পেশাদারি ভঙ্গিতে করছেন, এমন নয়। করছেন কিছুটা আপন খেয়ালে। ফলে, অনেক সময় ধারাবাহিকতা থাকছে না। মাঝে মাঝেই বলেন, 'রইল ঝোলা, চলল ভোলা' করে কোনদিন পালিয়ে যাব।

তবে এরপরও বলতে হবে, রাজনীতি নিয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে, যাঁরা আরও কিছু শিখতে চান, জানতে চান, তাঁরা এই চ্যানেলটি শুনতে পারেন। সব অনুষ্ঠান না হোক, যেগুলো ভাল লাগবে, সেগুলি শুনতে পারেন। দিনের শেষে আপনি কিন্তু সমৃদ্ধই হবেন। একটা মানুষের সারাজীবন ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতার কিছুটা ভাগ যদি আপনি পান, মন্দ কী! পরিশেষে, সুমনবাবুকেও অনুরোধ, দু একটা বিরূপ মন্তব্য দেখে বিচলিত হবেন না। এমন বেনোজল সর্বত্রই থাকে। তাঁদের পেছনে বেশি সময় বা মনযোগ কোনওটাই নষ্ট করার দরকার নেই। কিছু অর্বাচীন যেমন থাকবে, তেমনই মননশীল শ্রোতারও অভাব নেই। বাংলাস্ফিয়ারের এই নদী আপন খেয়ালে, তার নিজের মতো করে বয়ে চলুক। যার ইচ্ছে, সে নদীতে নামবে। কেউ না হয় দূর থেকেই দেখবে।

মিডিয়া সমাচার। বেঙ্গল টাইমসের একটি জনপ্রিয় বিভাগ। এখানে থাকে মিডিয়া জগতের নানা অজানা কথা, বিশ্লেষণ। তা কোনও কাগজ নিয়ে হতে পারে, কোনও চ্যানেল নিয়ে হতে পারে। এমনকী ইদানীং মূলস্রোত মিডিয়ার সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দেওয়া সোশ্যাল মিডিয়াও হতে পারে। পাঠকেরও আমন্ত্রণ। মিডিয়ার নানা দিক নিয়ে তাঁরাও পাঠাতে পারেন নিজেদের বিশ্লেষণ। তুলে ধরতে পারেন কোনও ইউটিউব চ্যানেল বা ফেসবুক গ্রুপকে।

আপনিও সেই হাড্ডিহীন চাড্ডির দলেই

নন্দ ঘোষ

(ময়ূখ রঞ্জন ঘোষ সমীপেষু)

ডিয়ার ময়ূখ,

ক্যামেরার সামনে চেল্লামেল্লি করে বাড়ি ফিরলেন, ফেরার পথে এসি গাড়িতে বসে ফেসবুকে প্রাত্যহিক মলত্যাগ করা সমাপ্ত হয়েছে নিশ্চয়ই। হাত ধুয়েছেন? মল লেগে ছিল থুড়ি কাতলার কালিয়া লেগে ছিল? বিবাহের ভোজসভার কাতলা কালিয়া? মুর্শিদাবাদ যখন জ্বলছিল, চাকরিহারা শিক্ষকরা যখন রাস্তায় ছিল, তখন যে নেতারা বিয়ে করছিল, সেই নেতাদের বিয়ের ভোজের কালিয়া? যে সাংবাদিকরা ৩৬পাটি আল আউট করে সেই বিয়ের খবর করেছে, তাদের কলমে, ক্যামেরায় লেগেছিল কাতলার কালিয়া?

প্রশ্ন করছেন ব্রিগেডে আসা জনতাকে। প্রশ্ন করার অধিকার আছে আপনার? যোগ্যতা আছে? একটাও উচিত প্রশ্ন করতে পারবেন আপনি? একটা প্রশ্ন যে প্রশ্ন রাসভের মতো চিল্লিয়ে করতে হয় না, ঘাতকের মতো নিঃশব্দে করতে হয়, যে প্রশ্ন শুনে শাসক মাথা নিচু করে পালানোর রাস্তা খোঁজে? হ্যাঁ ময়ূখ, প্রশ্ন শাসককেই করতে হয়, রাজ্যের

শাসককে এবং কেন্দ্রের শাসককে। শূন্য আসন পাওয়া, ১০ শতাংশের কম ভোট পাওয়া দলের যুবনেত্রীকে প্রশ্ন করে আইটি সেলের ভাইরা।

সাংবাদিক হয়ে, বাবুল সুপ্রিয়কে প্রশ্ন করতে পারবেন, আসানসোলে দাঙ্গা কারা করেছিল, কেন করেছিল? অর্জুন সিংকে প্রশ্ন করতে পারবেন, বিজেপি কর্মীদের দিকে বাপ-মা তুলে খিস্তি দিতে দিতে তেড়ে গিয়েছিল কে? শুভেন্দু অধিকারীকে প্রশ্ন করতে পারবেন, কংগ্রেসের দল ভেঙে মুর্শিদাবাদ-মালদায় তৃণমূলের মৌরসিপাট্টা কে স্থাপন করেছিল? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারবেন, কয়লা, বালি, গরু, চাকরি হরেক চুরির তদন্ত কোন পর্যায়ে দাঁড়িয়ে? আর জি করে, সন্দেশখালিতে কেন্দ্রের ঘাগু গোয়েন্দারা কী কেশ কর্তন করলেন? শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে পারবেন, নারদার ঘুষখোররা কবে ধরা পড়বে? দিলীপ ঘোষকে প্রশ্ন করতে পারবেন, রাজ্যের এই পরিস্থিতিতে কেন গিয়েছিলেন ইডেনে খেলা দেখতে?

অ্যাঁ! কী বললেন!! শুনতে পেলাম না! সাংবাদিকদের নিজ নিজ হাউসের পলিসি মেনে কাজ করতে হয়? ও মানে ফেসবুকে মন কি মলত্যাগ বলতে নেমেছেন? চাকুরি বজায় রাখার জন্য স্টুডিওতে চেঁচানো যথেষ্ট নয় ফেসবুকেও মলত্যাগ করতে হয়? মালিকের খুশি করতে হয়? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজেপির, সি বি আই পরিচালনা করে বিজেপি, অথচ সি পি এমকে গালাগাল দিয়ে দুর্নীতি, আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে তৃণমূলকে কতটা সুবিধা করে দিলে কতটা মলত্যাগ করলে নরেন ও গোঁসাই খুশি হয়?

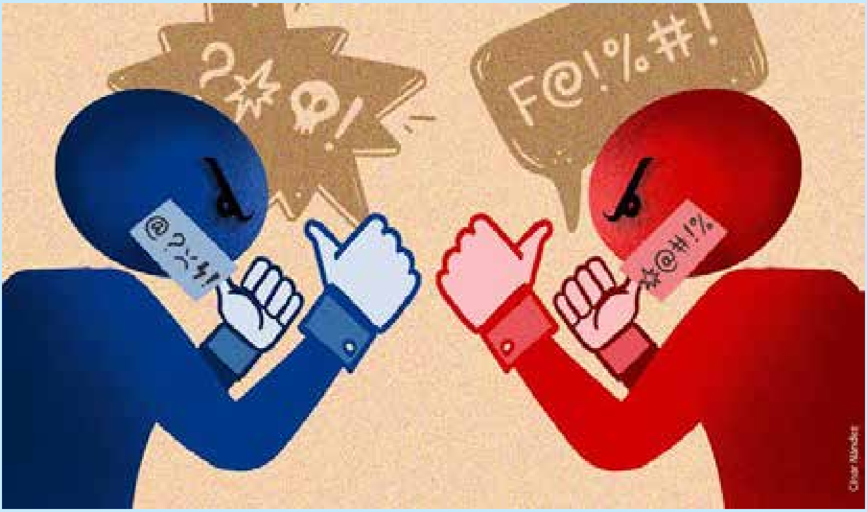

এই যে এত মানুষ। প্রতিবার ব্রিগেড আসে। তারা ভোটের সময় সিপিএমকে ভোট দেয় এটা জেনে যে তাদের দলের কেউ চাকরি চুরির দায়ে জেলে যায়নি, কাউকে দেখা যায়নি অন ক্যামেরা ঘুষ খেতে। তারা জানে যে তাদের কোনও নেতা জেলযাত্রা থেকে বাঁচার জন্য অন্য দল থেকে সিপিএমে আসেনি।

তারা ভোট দেওয়া সত্ত্বেও সি পি এম সরকার গঠন দূর, একটা আসনও পায় না, কারণ ময়ূখ, আপনার মতো সাংবাদিকরা, আপনার মতো আই টি সেলের ভাইরা, সব অন্যায়ের দায় তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে আসল অপরাধীদের বাঁচিয়ে দেন এবং শাসককে প্রশ্ন না করে মীনাক্ষীকে প্রশ্ন করেন।

পারলে ন্যাকামো ছেড়ে দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করুন, মুর্শিদাবাদে দাঙ্গার সময় আপনার লাঠি কোথায় ঘুরছিল? কোথায় বাইক চালাচ্ছিলেন? শুভেন্দুকে প্রশ্ন করুন, কংগ্রেসের হাতে থাকা পঞ্চায়েত ভাঙিয়ে কাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনি? প্রশ্ন করুন সিদ্দিকুল্লার সঙ্গে গা ঘষাঘষি করে কেন তাকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন?

সর্বোপরি নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন ময়ূখ, আপনার বৌদ্ধিক গণিকাবৃত্তির চাপে যে বিবেক মেরুদণ্ডহীন কেন্নোর মতো গুটিয়ে গেছে, তাকে প্রশ্ন করুন, চাকরি বাঁচানোর তাড়নায়, মালিককে খুশি করার তাড়নায় আপনি কি আর সাংবাদিক আছেন নাকি আপনিও হাড্ডিহীন চাড্ডিতে পরিণত হয়েছেন?

ছবি মুক্তির এত হুড়োহুড়ি কেন?

প্রশান্ত বসু

দুর্গাপুজো আসা মানেই একঝাঁক বাংলা ছবির মুক্তি। এমনটা আগেও ছিল। এখনও আছে। ফল কী হয়? পুজোর ব্যস্ততায় অনেক ছবিই দেখা হয় না। তারপর এক-দু সপ্তাহ যেতে না যেতেই হল থেকে নিঃশব্দে সেই ছবি ভ্যানিস হয়ে যায়।

পুজো এলেই তারকাদের মধ্যে, পরিচালকদের মধ্যে যেন একটা ইঁদুর দৌড়। কে কাকে টেক্কা দিলেন। এমনিতেই মাল্টিপ্লেক্সে বাংলা হল ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো। মেরেকেটে একটি শো হয়তো বাংলা চলে। তাও দুপুরের ফাঁকা স্লটে। তার ওপর যদি একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টি ছবি মুক্তি পায়, একটি

বা দুটি হয়তো ঠিকমতো হল পায়। বাকিগুলো হয়তো দূরের কোনও হলে একটি বা দুটি শো চলছে। ফলে, ইচ্ছে থাকলেও সেইসব ছবি আর দেখা হযে ওঠে না। অথচ, এইসব ছবি কিন্তু গুণমানের নিরিখে বেশ উন্নত।

প্রযোজকদের অনুরোধ, সব ছবি একসঙ্গে দুর্গাপুজোয় না এনে কিছু ছবি পয়লা বৈশাখকে সামনে রেখে বাজারে আনা হোক। একসময় পয়লা বৈশাখেই অনেক ছবির শুভ মহরৎ হত। অর্থাৎ, শুটিং শুরু হত। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে অনেক ছবি মুক্তিও পেত। আবার যদি সেই প্রথা ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে ভালই হয়। পুজোর সময় ছুটি থাকে ঠিকই, কিন্তু সবাই চারদিন সিনেমা হলেই কাটাবেন, এতখানি আশা করাটা বাড়াবাড়ি। উৎসবের আবহ ছেড়ে লোকে সিনেমা দেখতে যাবেনই বা কেন? বরং পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে যদি তিন–চারটি ভাল ছবি মুক্তি পায়, অনেকেই দেখতে পারবেন।

একবার বলিউডের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। আমির খান আর সলমন খানের ছবি একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে, এমনটা দেখা যায়! শাহরুখ খানের ছবি আর অক্ষয় কুমারের ছবি একসঙ্গে পর্দায় আসে? দক্ষিণী কোনও বিগ বাজেটের ছবি এলেও বলিউডের অনেক প্রোডাকশন হাউস নিজেদের ছবির মুক্তি পিছিয়ে দেয়। কারণ, একটাই দর্শক যেন ভাগ না হয়ে যায়। আমরা কি এখান থেকে কিছুই শিখতে পারি না? এমনিতেই বাংলা ছবির বাজার তেমন ভাল নয়। তার ওপর যদি নিজেরাই তাকে আরও ছোট করে আনেন, তাহলে সেই বাজার আরও খারাপ হতে বাধ্য।

এক ঘণ্টায় যদি বই আসত!

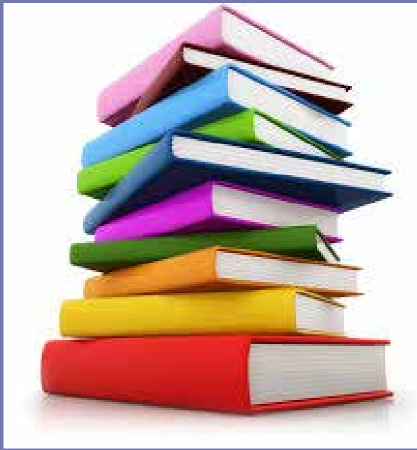

উত্তম জানা

কয়েক বছর আগেও যা ভাবা যেত না, আজ তা কত সহজে আয়ত্বে এসে গেছে। কোনও একটা অ্যাপে আপনি খাবারের অর্ডার দিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে তা আপনার দরজায় হাজির। এমনটা কি ভাবা গিয়েছিল? আগে ট্যাক্সি পেতে আপনাকে কত ঝক্কিই না পোহাতে হয়েছে। ট্যাক্সি চালকের কাছে কতবার 'না' শুনতে হয়েছে। এখন চূড়ান্ত অসময়েও আপনার বাড়ির দরজায় অত্যাধুনিক গাড়ি এসে হাজির।

কিন্তু আমি অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাই। অ্যাপের মাধ্যমে অনেক কিছুর মতো বইও অর্ডার দেওয়া যায়। সেটিও আপনার বাড়িতে পৌঁছে যায়। কিন্তু বড্ড দেরিতে। একটা বিরিয়ানির প্যাকেট আধঘণ্টায় চলে আসছে, সেখানে একটা বই পৌঁছতে দশ বারো দিন লেগে যাচ্ছে। এত দেরি কেন? এতে তো অর্ধেক আকর্ষণই চলে যাচ্ছে। আপনি আপনার পছন্দের কারও জন্মদিনে একটা ভাল বই উপহার দিতে চান, কিন্তু তা কবে পৌঁছোবে, আপনি নিজেও জানেন না। বা আপনার কোনও বই পড়তে ইচ্ছে হল, আপনি জানেন, সেটা সাতদিনের আগে আসবে না। এতে আপনার ভেতরের ইচ্ছেটাই যেন চলে গেল। অর্ডার দেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আপনি থমকে গেলেন।

পছন্দের খাবার যদি আধ ঘণ্টায় পাওয়া যায়, পছন্দের বই পেতে এত দেরি কেন? ফুড ডেলিভারি অ্যাপ যদি এত দ্রুত কাজ করতে পারে, বুক ডেলিভারি অ্যাপ কি আরও একটু গতিশীল হতে পারে না? বড় খাবারের দোকান যেমন আছে, তেমনই বড় বইয়ের দোকানও তো আছে। তাঁরা এত পিছিয়ে থাকবেন কেন? তাঁরা কি দ্রুত বই পৌঁছে দেওয়ার একটা উপায় বের করতে পারেন না? বাংলার প্রকাশকরা একটু ভেবে দেখতে পারেন।

পুরীর আড়ালে অন্য পুরী

সুমিত চক্রবর্তী

বাঙালির পুরী যাওয়া নিয়ে একটা কথা খুব চালু আছে। সে পাঁচ-ছদিন থাকে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, ধবলগিরি, কোনারক, চিল্কা, নন্দনকানন— যা যা আশেপাশে আছে, সব দেখে ফেলে। শুধু পুরীটা দেখাই বাকি থেকে যায়। সকালে বেরিয়ে পড়া। বিস্তর ঘুরে, ছবি-টবি তুলে সন্ধে নাগাদ ফিরে আসা। তারপর কেউ ডুবে যায় গ্লাসে। আবার কেউ বা টিভির পর্দায় মন সঁপে দেয় সিরিয়ালে। বড়জোর ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধেতে একটু বিচে গিয়ে বসা। এসব করতে গিয়ে পুরীটাই আর দেখা হয় না।

আমি একেবারেই উল্টো পাবলিক। আমি যতবার যাই, পুরীতেই থাকি। আশপাশের অনেককিছুই তাই না দেখাই থেকে গেছে। বেঙ্গল টাইমসে ভ্রমণের টুকরো টুকরো বিষয় উঠে আসছে। মনে হল, পুরীর ফরেনার ঘাট নিয়ে নিজের অনুভূতি তুলে ধরা যাক। প্রথমবার গিয়েছিলাম বছর দশেক আগে। তারপর গেছি আরও তিনবার।

প্রথম হদিশ দিয়েছিল এক অটোওয়ালা। জানতে চেয়েছিলাম, এখানে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। সে বেশ কয়েকটা জায়গার কথা বলেছিল। সেসব জায়গায় ঘোরানোর পর বলল, আরও একটা ভাল জায়গা আছে, যাবেন? তবে, সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকতে হবে। আপনাদের নামিয়ে আমি চলে যাব। পরে ফোন করে দেবেন। আমি এসে নিয়ে যাব। নইলে সমুদ্রের পাড় ধরে হেঁটেও চলে যেতে পারেন।

সে আমাদের ফরেনার ঘাটে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। মনে হচ্ছিল না, ওটা পুরী। মনে হচ্ছে, যেন গোয়ার সি বিচ বা বিদেশে কোথাও বসে আছি। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিদেশিরা। শীতের রোদ গায়ে মেখে ওরা সমুদ্রের পাড়ে। কে কোন দেশ থেকে এসেছে, বোঝা মুশকিল। কেউ আপন মনে বই পড়ছে। কেউ ল্যাপটপ নিয়ে লিখেই চলেছে। কেউ আবার গিটার হাতে গান গাইছে। কেউ একা একাই রোদে শুয়ে আছে (সান বাথ)। কোথাও কয়েকজনের জটলা চলছে। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে।

কয়েকজন আবার ইসকনের ভক্তও আছে। তারা তিলক কেটে, ধুতি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে অনেকের সঙ্গেই ইসকন বা ধর্মের তেমন সম্পর্ক নেই। তারা আপন মনেই বসে আছে। বেশ কয়েকজনকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে দেখেছি। কাউকে গিটার হাতে রবি ঠাকুরের গান গাইতেও শুনেছি। অনেকেই আসার পথে কলকাতা বা দার্জিলিং হয়ে এসেছে। সবমিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি।

সেই অনুভূতির টানেই আরও তিনবার গেছি। তার মধ্যে একবার গরমের দিকে। সেবার তেমন বিদেশির দেখা মেলেনি। আরও একবার গিয়েছিলাম বৃষ্টির মাঝে। সেবারও অনাবিল আনন্দে তাদের বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেছি। কেউ দৌড়ে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিচ্ছে। কিছুক্ষণ ঢেউ নেওয়ার পর আবার ফিরে এসে রোদে গল্প জুড়ে দিচ্ছে। আবার কিছুক্ষণ পর হয়ত আরও একবার জলে ঝাঁপ। কখনও অমলেট, কখনও ডাবের জল চলছে। এমনকী মশলা মুড়িও দিব্যি উপভোগ করছে

সেই বিদেশি পর্যটকরা।

আসার সময় হেঁটে হেঁটেই সমুদ্রের পাড় ধরে দিব্যি ফিরে আসা যায়। এমনকী, যাওয়ার সময়েও অটো না করে আপনি হেঁটেও চলে যেতে পারেন। বাঁ দিকে পাড় ধরে দু আড়াই কিমি হাঁটলেই পেয়ে যাবেন। যাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, সেই দেখিয়ে দেবে। সবমিলিয়ে ফরেনার ঘাট সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বেশ ভালই। কিন্তু যাঁরাই পুরী যান, তাঁদের অধিকাংশই ওদিকে পা মাড়ান না। হয় জানেন না। অথবা জানলেও তেমন আগ্রহ দেখান না। আশপাশের জায়গাগুলো তো রইলই। শীতের দুপুরে একবার ফরেনার ঘাট থেকে ঢুঁ মেরে আসতেই পারেন। পুরীর মধ্যে অন্য একটা পুরী আপনার মনে ছাপ ফেলতেই পারে।

ভ্রমণের লেখা মানেই কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা ছকে বাঁধা লেখা নয়। তার বাইরেও লেখার একটা বিরাট পরিসর থেকে যায়। বেড়ানোর টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা বা চরিত্রও লেখার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। শুধু সেটুকুই উঠে আসতে পারে আপনার লেখায়। আপনার অনুভূতি ভাগ করে নিন অন্যদের সঙ্গে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

বেঙ্গল টাইমস

২৫ এপ্রিল, ২০২৫

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in